সেলজুকী সালতানাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রফেসর ডঃ আলী মুহাম্মেদ সালাবী

সেলজুকী সালতানাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মূলঃ প্রফেসর ডঃ আলী মুহাম্মেদ সাল্লাবী

অনুবাদ

বুরহান উদ্দিন

সম্পাদক

হাবিবুর রহমান

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য

আখন্দ শরীফ সুহৃদ

প্রকাশকাল ২০১৭

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস হল একটি জাতির প্রাণ। একটি জাতির সমৃদ্ব অতীত সুন্দর একটি ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এইজন্যই ইসলাম, ইতিহাস চর্চার প্রতি অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও ইতিহাসের প্রতি অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন বলেই সমগ্র কুরআনে ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আমরা যদি সমগ্র পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি-শৃঙলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদের অতীত ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হবে। আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই খেলাফাতে রাশেদার পরে তিনটি বড় খেলাফাত (উমাইয়্যা, আব্বাসী, উসমানী) গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও আরো কিছু ছোট ছোট খেলাফাত ছিল। তারমধ্যে সেলজুক রাষ্ট্র, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই রাষ্ট্রটিই বাইজান্টাইনদের বিরুদ্বে এক বড় হুমকী সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা অনেকেই আজ এই রাষ্ট্র সম্পর্কে অবহিত নই। এই রাষ্ট্রটিকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বুরহান উদ্দিন

আঙ্কারা, ২০১৭

তুর্কীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মাওয়ারাউন নামক নদীর দেশে অবস্থিত আজকের তুর্কিস্তান নামক অঞ্চল এবং মঙ্গোলিয়া থেকে উত্তর চীন পর্যন্ত এবং পশ্চিম থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃতউত্তর সার্বিয়া থেকে নিয়ে দক্ষিন ভারত এবং ইরান পর্যন্ত ,) বিস্তৃত বিশাল এলাকা জুড়ে ওউজOğuz) নামক বিভিন্ন গোত্র বসবাস করত যারা তুর্ক নামে পরিচিত ছিল।

পরবর্তীতে এই গোত্রসমূহ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাদের আসল বাসভুমি ছেড়ে অভিবাসিত হয়ে ছোট এশিয়াতে)Anatoliya) তে চলে আসতে শুরু করে। তারা কেন সেখান থেকে অভিবাসিত হয়ে চলে এসেছিল এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন মূলত অর্থনৈতিক কারনেই তারা চলে এসেছিল।অব্যাহত ভাবে দুর্ভিক্ষ বেড়ে যাওয়া , খরার কারণে এবং জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সকল গোত্র সমূহ তারা নিজেদের দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।এবং তারা সহজেই তাদের জীবিকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলে তারা মুল রাজনৈতিক কারণে তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।তাদের চেয়ে জনবল এবং অর্থবলে শক্তিশালী মোগল গোত্রদের অব্যাহত চাপ এবং জুলুমের কারণে সেখান থেকে তারা চলে আসতে বাধ্য হয়। তুর্কিরাও একটি নিরাপদ এবং স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতে পারবে এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়ার আশায় সেখান থেকে চলে আসতে থাকে। ডঃ আব্দুল লাতিফ আব্দুল্লাহ বিন দাহিশ এই মতামতকে অত্যধিক গ্রহনযোগ্য মত বলে অবিহিত করেছেন।

এই গোত্রসমূহ ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলে আসে এবং জেইহুন নদীর তীরে আবাস্থল গড়ে তুলে।কিছু কিছু গোত্র এক সময়ে তাবারিস্তান এবং জুরজান নামক এলাকায় বসতি গড়ে তুলে এবং নিজেদেরকে তারা ইসলামী অঞ্চলের কাছাকাছি আবিস্কার করে। নিহাবেন্দ যুদ্ধ এবং ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের পরতনের পর ৬৪১ সালে মুসলমানগণ এই অঞ্চলও বীজয় করে নেন।

মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগসূত্রতা

৬৪২ সালে ২২ হিজরী)) মুসলিম বাহিনী আরও পশ্চিমের অঞ্চলসমুহকে বীজয় করার জন্য অভিযান পরিচালনা করে। সেই সমস্ত অঞ্চলে সেই সময়ে তুর্কিরা বসবাস করত।

সেখানে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আব্দুর রাহমান বিন রাবিয়ার সেনাবাহিনী তুর্কিদের বাদশাহ শাহিবরাজ এর মুখোমুখী হয়।সে আব্দুর রাহমান বিন রাবিয়ার কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলেমিশে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে। এটা শুনে আব্দুর রাহমান তাকে মূল সেনাপতি সুরাকা বিন আমরের নিকট পাঠায়।শাহিবরাজসুরাকার কাছে , গিয়েও একই কথা বলেন এবং তার কথা সুরাকা সাদরে গ্রহন করেন। এবং এই সকল অবস্থা জানিয়ে খলিফা উমর (রাঃ) তিনি একটি চিঠি লেখেন।তারা যা করছে তিনিও সেটা মঞ্জুর করে নেন।এর পর তারা উভয় পক্ষ সন্ধিচুক্তিতে সাক্ষর করেন। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সাথে তুর্কিদের কোন প্রকার যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি।বরং তারা একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আর্মেনিয় অঞ্চলকে বিজয় করে সেখানে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করে সেখানে ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য যাত্রা শুরু করে।

ইসলামের দাওয়াতকে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইসলামী সেনাবাহিনী পারস্য অঞ্চল বিজয় করার জন্য উত্তরপূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে।হ্যাঁ অবশ্যই এটাপারস্য সাম্রাজ্যে ইসলামী সেনাবাহিনী ,র নিকট পরাজয়ের পরেই সম্ভব হয়।এই সকল ভূমিতে ইসলামী বাহিনীর সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এই সকল চ্যালেঞ্জকে সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হওয়ায় ইসলামী সেনাবাহিনী তার লক্ষ্য পানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এই সকল দেশে বসবাস কারী জনসাধারণের তুর্কিরাও ছিল। এই ভাবে সমগ্র তুর্কি জাতী ইসলামের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সাথে মিশে যায়।তুর্কিরা ইসলামকে মনেপ্রানে গ্রহন করে নেয় এবং আল্লাহ তায়ালার কালিমাকে বুলন্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে যোগদান করে বীর মুজাহিদে পরিণত হয়।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান এর(রাঃ) সময়ে তাবারিস্তানও বিজিত হয়। এর পর ৬৫১ সালে ৫১ হিজরি)) মুসলমানগণ

জেইহূন নদীকে অতিক্রম করে মাওয়ারাউন নদীর আশে পাশের এলাকা সমূহকে দখল করে নেয়।ফলশ্রুতিতে সেখানে বসবাস তুর্কিদের বিশাল একটি অংশ দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করেইসলামকে রক্ষা করার জন্য এবং আলাহ , তায়ালার দ্বীনকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছেদেওয়ার জন্য তারা দলে দলে ইসলামী সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহন করে।

এবং পরবর্তীতেও এই সকল এলাকায় ইসলামের বিজয় অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।এইভাবে আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এর সময়ে (রাঃ) বুখারা বিজিত হয়। দ্বিকবিজয়ী এই বাহিনী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সমরকন্দের দিকে যাত্রা করে এই অঞ্চলকেও বিজয় করে নেয়। অবশেষে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওয়ারাউন নদীর তীরে অবস্থিত সমগ্র শহর ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী অনুশাসনের অধীনে আসে এবং সেখানের সকল গোত্র এই মহান সভ্যতার অধীনে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

আব্বাসী খিলাফাতের সময়ে তুর্কিদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং তারা আস্তে আস্তে গবর্নরসেনাপতি এবং শাসকের দায়িত্ব পেতে থাকে।তারা , পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অনুশাসনে চলে আসায় এবং খলিফার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার কারণে সর্বোচ্চ পদেঅধিষ্ঠিত হতে থাকে।

আব্বাসী খলিফা মুতাসীম তিনি তারা সময়ে তার দরজা তুর্কিদের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উম্মুক্ত করে দেন। তাদেরকে রাষ্ট্রের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন।মুতাসিমের মূল রাজনীতি ছিল তার শাসনে পারস্যদের প্রভাব কমিয়ে আনা।খলিফা মামুনের সময় থেকে আব্বাসী খিলাফাতে পারস্যদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মত।

তুর্কি দেরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে জনসাধারণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে এক মারাত্মক ক্রোধের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে খলিফা মুতাসিম তার প্রতি জনগনের এই ক্রোধকে ভয় পেয়ে যান।এর পর তিনি নতুন একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং (সামিরা) সেখানে তুর্কি সেনাবাহিনীকে সেখানে স্থানান্তর করেন। এইভাবে তিনি তাদেরকে বাগদাদ থেকে দূরে সরিয়ে নেন। ১২৫ হিজরিতে এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল।

তুর্কিরা এইভাবে ইসলামের সাথে পরিচয়ের পর বিশাল এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সেলজুক নামক এই রাষ্ট্রটি আব্বাসী খিলাফতের অধীনে ছিল।

সেলজুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাঃ

মুসলিম আরব অঞ্চলের পূর্ব দিকের এই ভূমিতে সেলজুকদের বহিঃপ্রকাশের পেছনে উপযোগী রাজনৈতিক শর্ত এবং সুযোগ সুবিধা ছিল।এই অঞ্চলে সুন্নি আব্বাসী খিলাফতের সাথে শিয়া ফাতিমী খিলাফতের দন্দ ছিল।

সেলজুকরা৫মে শতকে। এই এই বিশাল তুর্কি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল হিজরী , ছোট এশিয়া ,ইরাক ,মাওয়ারাউন নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা ,রাষ্ট্র খোরাসান পরবর্তীতে ,এবং শাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথমে ইরানের রেই(এনাতলিয়া) ইরাকের বাগদাদ এই বিশাল সেলজুক রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।সেই সময়ে খোরাসানের মাওয়ারাউন নদীর এলাকায় (কিরমান সেলজুক), শামেদের (এনাতলিয়ান সেলজুক) এবং ছোট এশিয়াতে (সিরিয়ান সেলজুক) মত ছোট ছোট সেলজুক রাষ্ট্র গড়ে উঠে। এই ছোট ছোট রাষ্ট্র গুলি বাগদাদের খলিফার আনুগত্য করত এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলত। ইরান এবং ইরাকে শিয়া মাজহাবের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য তারা আব্বাসী সুন্নিদেরকে সাহায্য করে।এবং তারা ফাতিমীদের কাছ থেকে মিশর এবং শাম কে তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। এইভাবে তারা শাম এবং মিশরের উপর তাদের একচ্ছত্র কতৃত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখান থেকে ফাতেমী খিলাফত উচ্ছেদ করে।

সেলজুকদের নেতা তুউরুলসালে উচ্ছেদ ৪৪৭ বুভেয়হীদের রাষ্ট্রকে হিজরি , করে এই অঞ্চল থেকে ফিতনা দূরীভূত করতে সক্ষম হন। যারা মসজিদের দরজায় সাহাবীদেরকে গালী দিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা টাঙাত তাদেরকে তিনি সমুলে উৎখাত করতে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি সীমা লঙ্ঘন কারী রাফেজি শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ আল জ্বালাবীকে তিনি হত্যা করেন।
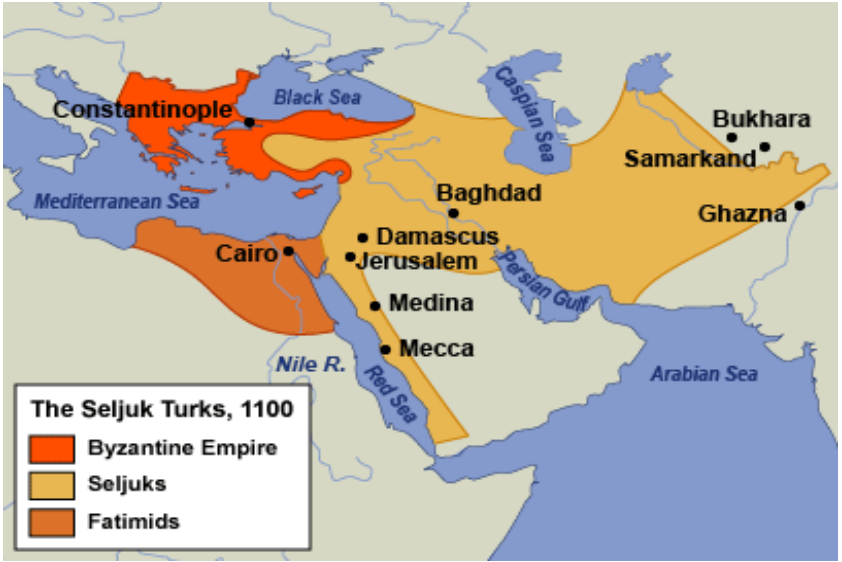
সেলজুক সালতানাতের মানচিত্র

বাগদাদের আব্বাসী খলিফার উপর এই বুভেয়হীদের প্রচণ্ড চাপ ছিল।সেলজুকগণ এই বুভেয়হী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদেরকে বাগদাদ থেকে অপসারণ করে। সেলজুকের সুলতান তুউরুলআব্বাসী খিলাফতের রাজধানী , বাগদাদে গেলে তৎকালীন আব্বাসী খলিফা কাইম বি আমরিল্লাহ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং তাকে সুলতান রুকুনুদ্দীন তুউরুল নামক উপাধীতে ভূষিত করেন। তাকে তার নিজের আসনের পাশে বসান এবং অনেক সম্মানে ভূষিত করেন।তার নামে মুদ্রাঙ্কিত করেন এবং বাগদাদ সহ অন্যান্য অঞ্চলের মসজিদে খুতবার সময় তার নাম উল্লেখ করা হয়। এইভাবে সেলজুকদের মান-মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে যায়।

সেই সময়ের পর থেকে সেলজুকরাবুভেয়হীদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠা , আব্বাসী খলিফাদেরকে সব চেয়ে বড় সাহায্য করেন এবং খলিফা সহজে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

সুলতান তুউরুলঅসাধারণ মেধাবী এবং সাহসী , একজন ব্যক্তিত্বশালী , একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দীনদার এবং আবীদ। আর এই কারনেই তিনি তার জাতীর কাছ থেকে অনেক বড় সমর্থন এবং সাহায্য পেয়েছিলেন।তিনি ''সুলজুকি তুর্ক'' নামক শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং ''শক্তিশালী রাষ্ট্র'' এই শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে যান।

আব্বাসী খলিফা কাইম বি আমরিল্লাহর সাথে পরবর্তীতে সুলতান তুউরুল সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায় এবং এই সম্পর্কের জের ধরে খলিফা সুলতান তুউরুলের বড় ভাই চেফরি সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেন। হিজরি ৪৪৮ সালে খ্রিঃ ১০৫৬)) এই বিবাহ সংগঠিত হয়। পরবর্তিতে হিজরি ৪৫৪ সালে সুলতান তুউরুল খলিফার মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এঁর পর সুলতান তুউরুল বেশী দ্বীন হায়াত পাননি। হিজরী ৪৫৫ সালে পবিত্র রমজান মাসের শুক্রবার রাতে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরন করেন।

সুলতান তুউরুলের মৃত্যুর পর সেলজুকগনপূর্ব - উত্তর ,ইরান ,খোরাসান , ইরাক অঞ্চলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুলতান মুহাম্মদ আলপারসলান

সুলতান মুহাম্মদ আল পারসলান তার চাচা সুলতান তুউরুলের মৃত্যুর পর সমগ্র এলাকায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।কিছু কাল পরে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলেও আলপারসলান সমস্যাকে সামলে নিয়ে সকল কিছুকে তিনি তার নিয়ন্ত্রনে নিতে সক্ষম হন। আলপারসলান তার চাচার মত অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং যোগ্য একজন নেতা ছিলেন। যে সকল অঞ্চল সেলজুকদের আধিপত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করছিলসে সকল এলাকায় সেলজুকদের প্রভাবকে , প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বিশেষ একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।যার ফলে তিনি সফলতা লাভ করেন।আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামের বানীকে আর্মেনিয়ারুমের মত খ্রিস্টিয়ান দেশ সমুহেও , পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি আপ্রান প্রচেষ্টা চালান।ইসলামের জিহাদী রুহু ,

আলপারসলানকে দেশ বিজয়ে পাগল পারা করে তুলে। এই রূহ তাকে দিয়েছিল এক অপরিসীম ইসলামী চেতনা। এবং তাকে বানিয়েছিল এক দ্বিকবিজয়ী বীর।সেলজুক সাম্রাজ্যের সেনাপতি গণ ছিলেন এই সকল জিহাদের অগ্রসেনানী। ইসলামের সেবায়ইসলামকে এই সকল ভূমিতে পৌঁছানোর জন্য , এবং ইসলামের পতাকাকে বাইজান্টাইনে সাম্রাজ্যের প্রসাদের উপরে উড়ানোর জন্য এবং এই মহান দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্যতারা ছিলেন পাগলপারা।

কিন্তু শেষের ৭ বছর এই রাষ্ট্রটি তার এই বিশেষ বিশিষ্টকে হারাতে শুরু করে। সুলতান আল পারসলান পুনরায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হনএবং তার সাথে সম্পৃক্ত সেলজুক রাষ্ট্রের সকল এলাকায় তিনি তার কতৃত্ত্ব , প্রতিষ্ঠা করার পর কিছ্ু অদুর ভবিষ্যতে কিছু পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি দীর্ঘস্থায়ী কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করেন।এসকল পরিকল্পনার মধ্যে ছিলফাতেমী খিলাফাতকে ,তার প্রতিবেশী খ্রিস্টান দেশগুলোকে বিজয় করা , জয় করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আব্বাসী খিলাফাতের পতাকাতলে সমবেত করা এবং সেলজুক রাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি করা। এই জন্য আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়াকে বিজয় করে ইসলামের পতাকা তলে আনার লক্ষ্যে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং এই সকল দেশকে বিজয় করে তিনি তার খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজয়ের পর এই সকল দেশে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি বিরামহীনভাবে প্রচেষ্টা চালান। আলপারসলান , শামের উত্তর দিকে সৈন্য সমাবেশ করে আলেপ্পর মুরদাসিয়া রাষ্ট্রকে অবরোধ খ্রিষ্টাব্দ ১০২৩) হিজরীতে ৪১৪ করেন। যে রাষ্ট্রটি)শিয়া মাজহাবের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সালিহ ইবনে মুরাদিস।
দক্ষিণের রামাল্লা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে ফাতিমীদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেই মিশরের প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত আস্কালানকে দখল করা সম্ভব হয়নি।

৪৬২ হিজরী খ্রিস্টাব্দ ১০৬৯))সালে মক্কার শাসক মুহাম্মাদ বিন আবু হাশিমের দূত সুলতানের কাছে এসে বলেন যেসুলতান কাইম বি আমরিলাহর সাথে , সুলতানের নামেও খুতবা পাঠ করবেন এবং মিসরের শাসক উবাইদার নাম

খুতবা থেকে বাদ দিবেন।পাশাপাশি আযানের বাক্য থেকেও হায়্যা আলাল)
এই অংশটিকেও বাদ দিবেন। (আমাল

এই কথা বলার পর সুলতান তাকে ৩০দিনার দেন এবং তাকে বলেন ০০০,
যে"মদিনার গভর্নর ও যদি একই কাজ করেন তাহলে তাকেও তিনি ২০ ০০০,
দিনার দিবেন"।

আলপারসলানের এই বিজয়ে রোম সম্রাট রমেন দিয়জেন খুবই খিপ্ত হয়ে উঠে। রোমান সম্রাট আলপারসলানের এই বিজয়কে তার জন্য হুমকি মনে করেন এবং এই অভিযানকে তিনি মোকাবেলা করার সিধান্ত নেন। মুসলিম সেলজুক বাহিনী৪৬ রোমক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য হিজরী ,৩ ১০৭১) খ্রিষ্টাব্দ)সালের আগস্ট মাসে মালাজগিরত নামক সমভূমিতে অবস্থান নেন।

ইবনে কাসীর বলেনঃ সেখানে রোমক সম্রাটরোম এবং ফ্রেঙ্কদের কাছ থেকে , পাহাড়ের মত বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলপারসলানকে মোকাবিলা করার জন্য আসেন। সৈন্যর সংখ্যা ছিল অগণিত। সেখানে প্রায়৩৫ ০০০, গোত্রপতি(patriarchজন সৈন্য। ২০০ ছিলেন।প্রতি গোত্রপতির অধীনে ছিল (তাদের সাথে গাজীদের মধ্যে ছিল ইস্তাবুলে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে আগত ১৫,০০০ সৈন্যঅপেশাদার সৈন্য।এক হাজার ঐতিহাসিক যারা ০০০,১০০ , অস্ত্রবহনকারী খন্দক খনন কারী দৈনঃদৈনিন সব লিখে রাখত।৪০০ ছ্িল।অপর দিকে তাদের কাছে ছিল ১০০০ ক্ষেপনাস্ত্র এবং ২ শত অভিজ্ঞ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী সৈন্য।

মালাজগিরত যুদ্ধের একটি অঙ্কিত ছবি

সুলতান তাদের এই সৈন্য বাহিনী থেকে ভীত না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। সুলতান খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে এই অভিযানে সফল হওয়ার জন্য দোয়া কামনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক এবং শাম থেকে সমর্থন নেওয়ার পর তাদেরকে তিনি শামের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং অন্যান্য মুসলিম এলাকা থেকে সাহায্য গ্রহন করেন।অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

তোমার জীবনের কসম হে নবী সে সময় তারা যেন একটি নেশায় বিভোর হয়ে !
মাতালের মতো আচরণ করে চলছিল।

এর পর সুলতান আল পারসলান তার সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। সেই সময় তার সাথে ছিল মাত্র ২০সৈন্য। আবু ন ০০০,াসর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক এই অবস্তাকে বিশ্লেষণ করেন বলেনঃ খতিবগণ মুজাহিদদের " জুমা নামাজের পর সূর্য দলে পড়ার পরে যুদ্ধ শুরু ,জন্য দোয়া করার পরে সুলতান আল ,উভয় পক্ষের সৈন্য বাহিনী মুখোমুখী হলে ,হয়। সেই সময়ে পারসলান তার ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সেজদায় পড়ে যান।মুখে মাটি মেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেন এবং তার কাছ থেকে বিজয় প্রত্যাশা করেন।ফলে মুসলমানদের উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসে এবং তারা বহু সংখ্যক রোমক সৈন্য কে হত্যা করে। এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রোমান সম্রাট রমেন দিয়জেনকে গ্রেফতার করে। তাকে রোমের এক গোলাম গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।তাকে যখন গাজী আল পারসলানের সামনে আনা হয় তখন সুলতান তাকে ৩ বার হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলেন
তাহলে ,আমাকে যদি তোমার সামনে এই ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হত-?তুমি আমাকে কি করতে
রোমক সম্ -রাট জবাবে বলেনআমি তোমাকে সকল প্রকার নির্যাতন করতাম। ,
,মুসলিম সেনাপতি আলপারসলান তাকে বলেন -" আচ্ছা তাহলে আমি তোমাকে কি করব বলে তুমি চিন্তা করছ?"

হয়ত আমাকে হত্যা করে সমগ্র শহরে প্রদর্শন “ রোমক সম্রাট জবাবে বলেন - অথবা ক্ষমা করে দিয়ে মুক্তিপন নিয়ে আমা,করবেকে আমার দেশে পাঠিয়ে দিবে।

“ ইসলামের মহান সেনাপতি সুলতান আলপারসলান তাকে জবাবে বলেন - আমি ত তোমাকে ক্ষমা করে দিয়ে মুক্তি পন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাই করি ”নাই।

এর পর তার কাছ থেকে ১দিনার মুক্তিপনের বিনিময়ে মুক্ত করে ০০০,৫০০, দেন। এবং সুলতান দাঁড়িয়ে তাকে পানি প◌ান করার জন্য নিজ হাতে পানি দেন। রোমান সম্রাটও খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার সামনে এসে মাটিতে চুমা দেন।পরে নিজেকে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সুলতান তাকে ১০দিনার দেন। সেনাপতিদের মধ্য থেকে ০০০, একজনকে দিয়ে তাকে সসম্মানে এগিয়ে দেন এবং গার্ডদিয়ে নিরাপদে তাকে তার স্বদেশে রেখে আসেন। তাকে যেসকল সৈন্য গণ এগিয়ে দেওয়ার জন্য যান তারা তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় ”লা ইলাহা ইল্লাহু“ লেখা খচিত একটি পতাকা বহন করেন।

মূল বিষয় হল১৫ সুলতান আল পারসলান শুধুমাত্র,,০০০ সৈন্যের এই মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে দুই লক্ষাধিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস করেছিলেন মূলত ঈমাণী শক্তির বলে। তাদের এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি গায়েবী সেনাবাহিনীকেও দেখেছিলেন। যার ফলে তিনি এই ছোট এশিয়াতে খুব সহজেই রোমের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।রোম সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্ব পূর্ণ ঘাটি এবং বহু স্থাপনা এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।উসমানীদের হাতে যে পরবর্তীতে রোমকগণ পরাজিত হয়েছিলউসমানীদের সেই বিজয়ের , ক্ষেত্রে সুলতান আলপারসলানের এই বিজয় এক মাইলফলক হিসাবে কাজ করেছিল।

আলপারলান ছিলেন অত্যন্ত ভাল এবং পরহেজগার একজন মানুষ।বিজয়ের জন্য তিনি বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রস্তুতি গ্রহন করেছিলেন।যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতির প্রাক্কালে তিনি আলেমদের কাছে যান এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহন করেন। সেই সময়ের প্রাজ্ঞ আলেমআলেমে রাব্বানি ,

আবু নসর মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক আল বুখারি আল হানাফী নসিহত করার সময় সুলতান আলপারসলানকে বলেন ,
যেই দ্বীনের বিজয়ের ব্যাপারে ,তুমি এমন একটি দিনের জন্য যুদ্ধ করছ যে“ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদাকরেছেন।এই দিন সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হবেই হবে।আর আমি আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার মাধ্যমেই এই বিজয় সম্পন্ন করাবেন। তোমার হাত দিয়েই তিনি তার শত্রুদের পরাজিত করবেন। তাই তুমি জুমার দিন এমন সময়ে যুদ্ধ শুরু করবেযখন , সেই সময়ে ,ইমামগণ মসজিদের মিম্বারে খুৎবা দেওয়ার জন্য দাড়ায়। কেননা তারা যুদ্ধরত সকল মুজাহিদের জন্য দোয়া করে থাকনে।”
অতঃপর সেই সময় আসার পরএই মহ ,ান সেনাপতি তাদের সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করেন।এর পর তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাতর কণ্ঠে দোয়া করার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তার সাথে তার সহযোদ্ধাগণও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।তার দোয়ার সাথে তার সহযোদ্ধাগণও আমীন বলতে থাকেন। এর পর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ
কেও যদি আমার এই বাহিনী থেকে পৃথক হতে চায় তারা পৃথক হয়ে চলে যেতে পারে। কেননা তোমাদের সুলতান তোমাদের কাউকে জোর জবরদস্তি করে এখানে নিয়ে আসেননি।
তিনি তার হাতের তীর ধনুককে মাটিতে ছুড়ে ফেলে বীরবিক্রমে ঘোড়াপিঠে চেপে বসে নিজের হাতে পা কে শক্ত করে বাঁধেন।এবং তার সৈন্যবাহিনীর মুজাহিদগণও তার অনুরূপ করেন।এর পর তিনি সাদা কাফনের পোশাক পরিধান করেন এবং বলেনঃ
আমি যদি শহীদ হই তাহলে এটাই আমার কাফন। ,
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এমন সেনাদলের উপরিত মহান রবের সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে।
সুলতান আলপারসলানকে হিজরি ৪৬৫ ,(১০৭২সালের রবিউল আও (য়াল মাসের ১০ তারিখে ইউসুফ আল হারিজম নামক এক ব্যক্তি হত্যা করে। মারভ শহরে তার পিতার কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। এর পর তার ছেলে মালিকশাহ তার স্থলাবিষিক্ত হন।

সুলতান আল পারসলানের চরিত্রিক গুণাবলীঃ

সুলতান আল পারসলান ছিলেন অত্যন্ত নরম হৃদয়ের একজন মানুষদরিদ্র , মানুষের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র।সর্বদায় আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন।একদিন তিনি মারভ শহরে দরিদ্রদের মাঝে সাহায্য বিতরণ করার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছেবলেন যাতে করে আমি ,হে আল্লাহ তুমি আমাকে আরও বেশী সম্পদ দান কর " ১৫ এক রমজানে তিনি "আরও বেশী করে দান করতে পারি।,০০০ দিনার সাদাকা বিতরণ করেন। তার মন্ত্রীপরিষদের সভায় এক তালিকায় দেখেন যে তার দেশে অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। তিনি তাদের সবার কাছে সাহায্য পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। তার শাসনামলে তার রাজ্যের কোথাও কোন প্রকার দারিত্রতা কিংবা কোন ধরণের অপরাধ সংগঠিত হয় নি।

কেউ কেউতার উজির নিজামুলমূলকের বিরুদ্ধে তার কাছে কিছু চিঠি লিখেন , নিজামুলমূলকের এত এত সম্পদ রয়েছে। এর পর তিনি ,এবং তার বলেন যে তার উজির নিজামুল মূলককে ডেকে বলেন

পড়ে দেখ যদি তোমার বিরুদ্ধে তাদের এই সকল অভিযোগ ,এই চিঠি নাও" সত্য হয় তাহলে তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর এবং তোমার অবস্থার পরিবর্তন কর। আর যদি অসত্য হয় তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের "ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

জনগনের সম্পদ রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক।তার শাসকগণের মধ্যে একজনতার বন্ধুদের জন্য বাইতুলমালের সম্পদ দিয়ে , উপহার স্বরূপ কাপড় ক্রয় করেন এই কথা শুনে সুলতান আলপারসলান তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। এর ফলে অন্যান্য শহরের শাসকগণ এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে যান এবংএসকল কাজ থেকে যোজনযোজন দূরে অবস্থান করেন। -কায়দাসম্পর্কিত বইপুস্তক সমূহ -রাজা বাদশাহদের ইতিহাস এবং আদব পড়তেন এবং পড়াতেন। একই সাথে শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে এবং তিনি যে ওয়াদা করতেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ফলে সব জায়গায় তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে যারা তাকে পূর্বে গ্রহন না করত তারাও তাকে গ্রহন করা শুরু করে এবং মাওয়ারাউন নদীর পাদদেশ থেকে নিয়ে শামের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত সকলেই তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

খিলাফত ও সালতানাতকে একত্রিত করার ফলে মালিকশাহর সময়ে সৃষ্ট সংকটঃ

আল পারসলানের মৃত্যুর পর মালিকশাহ সুলতান হন। কিন্তু কিরমান সেলজুকীদের সুলতান এবং তার চাচা কাভরুদ বিন জাফর তার বিরধিতা করেন এবং তাকে সুলতান মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এবং তারা সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেন। ফলে হামেদানের নিকটে তাদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষে কাভরুদ পরিজিত হয় ও নিহত হয়। এর পর মালিকশাহ কিরমান সেলজুকীদের অঞ্চলও তার শাসনাধীন করে নেন। এবং সেখানে তার ভাইয়ের ছেলে সুলতান শাহকে শাসক হিসাবে নিয়োগ দেন।

সুলতান মালিকশাহের সময়ে সেলজুকী রাষ্ট্র তার সীমানা বৃদ্ধি করে বেওং আরও প্রসারিত হয়। পূর্বে আফগানিস্তানপশ্চিমে আনাতলিয়া এবং দক্ষ ,িনে শাম পর্যন্ত তার রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। ১০৭৫ সালে আতসিজের হাতে শামের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা জারী থাকে।

মালিকশাহ ১০৭৫ সালে শাম অঞ্চলকে তার ভাই তাজুদ্ দাউলা তুতমুশের হাতে সমর্পণ করেন।

তিনি এই বিজয়াভিযানে অংশগ্রহন করেন বলে তাকে তিনি এই অঞ্চলের শাসন ভার দান করেন। তাজ উদ দউলা এখানে সেলজুকি শাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।এর পর ছোট এশিয়ার শাসনভার দান করেন তার আত্মীয়দের মধ্যে একজনকে এবং রোমের সাথে সম্পৃক্ত ছোট ছোট প্রদেশের শাশন কর্তা নিয়োগ করেন সুলায়মান বিন কুতালমিশ বিন ইসরাইলকে। তার বিজয়াভিযানে অংশগ্রহন করার কারণে ৪৭০ হিজরি সালে ১০৭৭))এই কাজ করেন। তিনিও আনাতলিয়া সেলজুকি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাষ্ট্র দীর্ঘ ২২৪ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়এই রাষ্ট্র আবুল ফাওয়ারিস কুতালমিশ বিন ইসরাইল নামক বংশ কর্তৃক , পরিচালিত হয়। আর এদের মধ্যে সুলায়মান বিন কুতালমিশকে তাদের প্রতিষ্ঠা হিসাবে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীতে এই রাষ্ট্র হিজরি ৪৭৭ তে সালে প্রথমে আন্তাকিয়া এবং (১০৮৪) পরবর্তীতে কনিয়া শহরকে বিজয় করে আরও বেশী শক্তি অর্জন করে। কনিয়া

শহর ছিল রোমকদের সব চেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে সম্পদশালী শহর।বিজয়ের পর সেলজুকীগণ এই অঞ্চলের খ্রিস্টানদ ের মোণ জয় করে তাদেরকে মুসলমান বানান। এই রাষ্ট্রটিও হিজরি ৭০০ তে সালে ১৩০০)) মঙ্গল রা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। পরবর্তীতে ওসমানীগণ এটাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে।

আনাতলিয়ার সেলজুকীগণছোট এশিয়াকে তুর্কদের কে বসতি গড়তে সাহায্য , করেন এবং সেখানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আলোকে রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে অনেক ইচ্ছুক ছিলেন। তার এই অঞ্চলকে ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শের আলোকে গড়ে তুলেন। এবং তার পূর্বে অবস্থিত খ্রিস্টান ইউরোপীয়ানদ ের শক্তিশালী ঘাঁটিকে দখল করে নেন।যা রোমক ইসলাম এবং ইসলামী দেশ সমূহের বিরুদ্ধে কাজে লাগাত। প্রয়োজনীয় শক্তি এবং লোকবল থাকার পরেও অপর রাষ্ট্র যা হুমকি হিসাবে কাজ করতেছিল সেটা ছিল শাম এবং মিশরে অবস্থিত ফাতিমী রাষ্ট্র। এর পর মালিকশাহ এই ২ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে ফাতিমী রাষ্ট্রকে উৎখাত করে তার রাষ্ট্রের অধীন করে নিতে সক্ষম হননি।

সেনাপতি আতসিজমিশরে অভিযান পরিচালনা করতে চান। কিন্তু উজির , সালে এক আরব সৈন্যবাহিনীর সাথে ১০৭৬ বাদরুল জামিল আসার পূর্বেই যুদ্ধে পরাজিত হন। আতসিজ এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিতে থাকেন কিন্তু সেই সময়ে তারা রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে।ফলে সেও যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাকে হত্যা করা ফলে তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে।

একই ভাবে মালিকশাহতার মেয়েকে আব্বাসী খলীফা মুক্তাদি বি আমরিল্লাহর , কাছে বিয়ে দেওয়ার পরেও আব্বাসী খিলাফতের কর্ণধার তার পরিবারকে করতে অক্ষম হন।মালিকশাহের সেই মেয়ের গর্ভ থেকে একজন সন্তানও জন্ম নেয়। অপর মেয়েকে তিনি আব্বাসী খলিফা আল মুস্তাজহিরের কাছে বিয়ে দেন। এত কিছুর পরেও খিলাফাত এবং সালতানাত তার নাতীতের হাতে ন্যস্ত হয়নি।

মৃত্যুঃ

সুলতান মালিকশাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার সাম্রাজ্যের উত্থান পতন শেষ হয়ে যায়। হিজরী ৪৪৭ পর্যন্ত ৪৮৫-(১০৫৫জন সুলতানের সময়ে ৩ (১০৯২-সেলজুকীয় সাম্রাজ্য অত্যন্ত শক্তিমত্তার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তারা হলেন তুউরুল বেয়, আলপারসলান এবং মালিকশাহ। এদের পর এই রাষ্ট্র দুর্বল হতে শুরু করে।সেলজুকী রাষ্ট্রের শক্তিশালী হয়ে উঠার পেছনে যার সব চেয়ে বেশী ভুমিকা ছিল তিনি হলেন উজির নিজামুল মূলক। তার সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিজামুল মূলকঃ

ইমাম যাহাবী (মহান উজির) উজিরে কাবীর" তাকে (রঃ), নিজামুল মূলক এবং দ্বীনের শক্তি "নামে অভিহিত করেছেন। আবু আলী হাসান বিন আলী ইবনে ইসহাক আল তুসী তাকে দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ,মহৎ ,দ্বীনদার ,প্রত্যুৎপন্নমতি , ফকীহ এবং সভাসদের গঠনকারী বলে অবিহিত করেছেন। ,ক্বারী

তিনি বাগদাদেনিশাপুরে এবং তুসী তে বিশাল বিশাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা , -করেছেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে অধিক গুরুত্ত্বারোপ করেনছাত্রদের জন্য বৃত্তির , ব্যবস্থা করেন এবং হাদীস বিভাগের প্রচলন করেন।যার ফলে বিভিন্ন স্থানে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি সুলতান আল পারসলান এবং তার ছেলে মালিকশাহের প্রধান উজিরের দায়িত্ত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রের সম্প্রসারন এবং এর বিকাশের লক্ষ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। সকল প্রকার জুলুম ও অবিচার দূরীভূত করেন এবং জনগনের সাথে বন্ধুত্ত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং সর্বদায় নিজেকে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। তিনি বিভিন্ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।অনেক বড় বড় ব্যক্তি তার কাছে আসেন এবং জনগন ও ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। মালিকশাহর কছে তিনি প্রস্তাব করেন যে ,দ্বীনদার ,যাতে করে উত্তম চরিত্রবান , সাহসী এবং বীরপুরুষদেরকে নেতা ও শাসক নিযুক্ত করা হয়। এই ধরণের রাজনীতির ফলে পরবর্তীতে তারাভাল ফলাফল বয়ে আনতে পারে এবং রাষ্ট্র

সত্যিকার অর্থেই জনগনের রাষ্ট্রে পরিণত হয়।এদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন হালেপইহতিয়ার (ওয়ালী) দিয়ারবাকির এবং মারদিনের শাসক , ,আকসুনার(যিনি ছিলেন নুরেদ্দিন মুহাম্মাদ জঙ্গির দাদা(। ইবনে কাসীর তার সম্পর্কে বলেন ,
শাসকদের জীব"নাচরণের মধ্যে তার জীবন ছিল সব চেয়ে উত্তম এবং তিনি ছিলেন উদার ও মহৎ "

ছবিঃ নিজামুল মূলকের মাদ্রাসার সমূহের একটি মাদরাসা

তার ছেলে ইমাদুদ্দিন জঙ্গিক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে সেনাপতির দায়িত্ব , পালন করেন। এর পর তার স্থানে দায়িত্ব পালন করেন নুরুদ্দিন জঙ্গি।এই সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বাইতুল ,পরিবার ছিল এমন পরিবার যে পরিবার মুকাদ্দাস বিজয়ের দ্বার উম্মোচন করেন তার সময়ের জন্য জমীন প্রস্তুত করেন। রোম এবং সকল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এই পরিবার জিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন এবং মুসলিম বিশ্বকে তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।
সেলজুকী সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন আকসুনার আল বুরসাকী। তিনি ছিলেন মুসুলের আমীর এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ করেন। ৫১০ হিজরিতে বাতিনীরা তাকে হত্যা করে। তিনি সেই সময় মুসুলের জামীকাবীরে নামাজরত অবস্থায় ছিলেন।ইবনে আসির তার সম্পর্কে – ই - বলেন

জ্ঞানী ব্যক্তি ,উত্তম একজন মানুষ ছিলেন ,তিনি ছিলেন একজন তুর্কি শাসক “ এবংসৎকর্মশীলদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন একজন আদীল এবং সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার করতেন। সর্বোত্তম শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন এবং রাতে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন”।

ঐতিহাসিক আবু শামাযিনি সেলজুকী আমলের একজন ঐ ,তিহাসিক তিনি বলেন ,“ সেলজুকী সেনাবাহিনী খলিফার মহিমাকে বুলন্দ করেছিলেন।বিশেষ করে নিজামুল মূলকের সময়ে।কেননা তিনি খলিফার মান সম্মান এবং মহিমাকে এক উচ্চ আসনে নিয়ে আসেন”।

রাষ্ট্রীয় সংস্কারঃ

মালিকশাকসেনাবাহীনির ,রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেওয়ার অব্যবহিত পরেই , সাথে সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান করেন।সেনাবাহিনীর সদস্যগণ জনগনের সম্পদ আত্মসাৎ করত এবং এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাঁধা হয়ে দাঁড়াত নিজামুল মূলক। তিনি এই ক্ষেত্রে তার সকল শক্তি দিয়ে সেনাবাহিনীকে বাঁধা দিতেন।তাদের এই আচরনের ফলে জনগন ছিল বঞ্চিত এবং নির্যাতিত।নিজামুল মূলক সুলতানকে এই ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দেন এবং এর সমাধানের জন্য তার কাছে সমাধান উপস্থাপন করেন।তিনি সুলতানকে বলেন সেনাবাহিনীর এমন কার্যক্রমের ফলেসম্মান বিনষ্ট -সালতানাতের মান , রাজনীতি ভিন্ন দিকে মোড় ,এর ফলে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ হতে পারে ,হচ্ছে নিতে পারে এবং অই সকল এলাকা হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুলতান তাকে বলেনঃ

এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এবং সংশোধনের জন্য আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করেন।

নিজামুল তাকে উত্তরে বলেন,

আপনার অনুমতি ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

এর উত্তরে সুলতান তাকে বলেন,

ছোট বড় সকল কাজের দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করেন।আপনি আমার পিতার সমতুল্য। এই কথা বলে রাষ্ট্রীয় কাজে তার প্রভাব বৃদ্ধি করেন এবং তিনি যাতে সহজে কাজ করতে পারেন তার জন্য সকল বন্দোবস্ত করেন।এবং তাকে তিনি সুন্দর কিছু উপাধি দেন। যেমন একটি ছিল আতাবেই ,। যার অর্থ হল আমীরের পিতা।ফলশ্রুতিতে তার সুন্দর জীবনউত্তম চরিত্র বীরত্ব জনগনের মাঝে প্রকাশিত হয়। জনগন তাকে , একজন অকৃতিম বন্ধু ভাবতে শুরু করে। যার ফলে দুর্বল এবং বৃদ্ধ মহিলাগণ তিনিও মনোযোগ সহকারে তাদের কথ ,তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো শুনতেন এবং তাদের সাথে কথা বার্তা বলতেন।কিছু কিছু গভর্নর ছিল যারা এই কাজ করত না। তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হতেন এবন তাদের বলতেন যেআমি আপনাদেরকে এই সকল কাজের জন্য নিযুক্ত করেছি। সেনাপতি , এবং শাসকদেরকে সেবা করার জন্য নয়। তাদের আপনাদের কাছ থেকে সেবা নেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। এই কথা বলে তিনি তাদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতেন।

জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসাআলেম ওলামাদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি,
তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান অনেক ভালোবাসতেন। ইলমে হাদীসের প্রতি তার ছিল - ,চরম ঝোঁক।এবং তিনি বলতেন“আমি হাদীস রেওয়ায়েতকারী নই। কিন্তু আমি নিজেকে তাদের কাতারে নিজেকে শামিল করতে চাই যারা আল্লাহর রাসুলের ”হাদিসকে বর্ণনা করে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় (সঃ)।
তার মজলিস গঠিত হয়েছিল আলেম এবং ফকিহদের সমন্বয়ে। এমনকি তিনি সর্বদায় তাদের সাথে থাকতেন তাদের সংগ লাভ করতেন।কেউ যখন তাকে বলত ,
এরা আ-পনার অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করেতিনি তাদেরকে এই জবাব দিতেন , এরা হল দুনিয়া এবং আখিরাতের সৌন্দর্য। আমি যদি তাদেরকে আমার - মাথার উপরেও রাখি তাহলে তাদের যে মর্যাদা এবং সম্মান সে তুলনায় অনেক কম।
আবু কাসেম আল কুশাইর এবং আবুল মায়ালী আল জুবাইনী যখন তার কাছে আসতেন তখন তিনি তাদের সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন এবং তাদের সাথে তিনি

বসতেন। আবুল আলী আল ফারেন্দি যখন আসতেন তখন তিনি তাকে বসার জন্য তার নিজের আসন ছেড়ে তাকে তার আসনে বসাতেন। এবং তিনি তার সামনে বসতেন। এই জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়ে বলতেন এরা ২ জন যখন আমার কাছে আসে তখন তারা আমার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করে যেযে গুণাবলী , সমূহ আমার মধ্যে নেই সেইগুলাও তারা বলে। এই ভাবে মানুষ আত্মপূজারী হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় জেগে উঠে। কিন্তু যখন আবু আলী আল ফারেন্দী আমার কাছে আসেন তিনি আমার ভুল ত্রুটি সমূহ আমাকে ধরিয়ে দেন এবং আমার করনীয় সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করেন। যার ফলে আমার মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি হয় এবং আমি যাতে সেই দোষ ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকতে পারি এই জন্য প্রচেষ্টা চালাই।

ইবনুল আসীর তার সম্পর্কে বলেন,

তিনি ছিলেন একজন ,তার সম্পর্কে আমার কাছে যে তথ্য আছে তা হল“ ,আলেমদ্বীনদারধৈর্যশীল। গুনাহকার এবং অপরাধীদের ,ন্যায়পরায়ন,উদার, নিকট তিনি ছিলেন নরমদীল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন। তার মজলিস মুসলিমদের নেতা এবং সৎকর্মশীলদের ,ফকীহ ,কারী ,ওলামা-ছিল আলেম ”দ্বারা পরিপূর্ণ।

তিনি ছিলেন হাফিজে কুরআন। তিনি ১১ বছর বয়সে হাফিজ হোন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী এবং সব সময় অবশ্যই ওযু করে বসতেন। ওযু করার পর অবশ্যই তিনি নফল নামাজ আদায় করতেন।

মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সাথে সাথে সকল কাজ বাদ দিতেন। আযান শেষ হওয়ার পরে নামাজ না আদায় না করে তিনি কোন ধরণের কাজ কর্ম করতেন না। মুয়াজ্জিন যদি আযান দেওয়ার ব্যাপারে কোন ধরণের গাফলতি করত তাহলে সাথে সাথে তাকে সতর্ক করতেন এবং আযান দেওয়ার আদেশ দিতেন। যারা সময়কে রক্ষা করেন এবং ইবাদতের ব্যাপারে অনেক বেশী সংবেদনশীল এটা হল তাদের অবস্থা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। একবার তিনি বলেছিলেন ,“ আমি একবার সপ্নে শয়তান কে দেখলামতাকে বললাম তোর , আল্লাহ তোকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোকে বলেছিলেন আমাকে ,জন্য লজ্জা সিজদা কর। কিন্তু তুই তার এই আদেশ অমান্য করেছিলি। আর তিনি আমার

আমাকে সিজদা কর। সেই অবস্থায়ও আমি ,কাছে এসে আমাকে বলেননি যে ”তাকে দিনে কতবার সিজদা করি।

তিনি সব সময় মনে প্রানে চাইতেন যে তার জন্য একটি মসজিদ থাকবে যেখানে তিনি নির্জনে একান্তভাবে মহান রবের ইবাদত করবেন। তিনি বলেতেন,
আমি আমার রবের জন্য একান্ত ভাবে নির্জনে ইবাদত করতে চাই। এর পর “ প্রতিদিন আমার জন্য একটি করে রুটি তৈরি করব সেটা খেয়ে সেখানে ইবাদত করব এমন একটি মসজিদ থাকবে”।
প্রতি রাতে তিনি খাবার খাওয়ার সময় যে কত বিনম্র হয়ে খাবার গ্রহন করতেন তা তার এই আচরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। খাবার খাওয়ার সময় তিনি তার এক পাশে তার ভাই আবুল কাসেমকে বসাতেন অপর পাশে বসাতেন খোরাসানের তার এক ভক্তকে তার পাশে বসাতেন ২ হাত কাটা একজন ফকিরকে। নিজামুল মূলক দেখলেন যে খোরাসানের সেই ব্যক্তি হাত কাটা সেই দরিদ্র লোকের পাশে বসে খাবার খেতে ইতস্তত বোধ করছেন। এটা দেখে তিনি তাকে সেখান থেকে উঠার নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে গিয়ে সেই লোকের পাশে বসেন এবং এক সাথে খাবার খান।দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করাতাদের , সাথে খানাপিনা করা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস তিনি এই কাজ করতে খুবই ভালোবাসতেন।

মৃত্যুঃ

হিজরি ৪৮৫ পবিত্র রমজান মাসের দশম দিনে বৃহস্পতিবার ইফতারের সময় নিজামুল মূলক নামাজ পরে ইফতারি করার জন্য দস্তর খানে তিনি বসেন। তার পাশে ছিলেন ফকীহগণ কারীগণএবং দরিদ্র মানুষগণ। নিহাবেন্দ থেকেও , সেদিন মুসাফির গণ এসেছিল। তিনি তাদেরকে সেই স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে এর সময়ে (রাঃ) বলতেছিলেন।আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ফারেসী এবং মুসলমানদের মধ্যে কি হয়েছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা করতেছিলেন। একই সাথে সেই সময়ে যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ মুসলমান

হয়েছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতেছিলেন।নিজামুল মূলক বলেন তারা “
”কতই না সুভাগ্যবান
ইফতার শেষ করে তিনি তার হারেমের দিকে যাত্রা করেন।সেই সময় হঠাৎ করে এক আগুন্তক তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে প্রহার করা শুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে বাতিনীদের দ্বারা সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি হলেন নিজামুল মূলক। এই খবর অতি দ্রুত সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চস্বরে সকল স্থানে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়। সুলতান মালিকশাহ এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে ছুটে আসেন এবং নিজামুল মূলকের পাশে বসেন। এর অতি অল্প সময় পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
হত্যাকারীর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তার স্থান সম্পর্কে জানা যায়। এবং তাকে পেয়ে সাথে সাথে হত্যা করে। কিছু কিছু সেবকগণ বলেন যেনিজামুল , মূলক বলেছিলেন আমার হত্যাকারীকে হত্যা করো না। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।এর পর তিনি কালেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করে মৃত্যু বরন করেন।
নিজামুল মুলকের মৃত্যুর খবর বাগদাতে পৌঁছার সাথে সাথে তারা অনেক কষ্টিত ও ব্যথিত হন। উজির এবং গভর্নরগণ তিনি দ্বীনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেন। কবিগণ তার নামে কাসিদে এবং মারসিয়া রচনা করেন।
ইবনে উকিল তার সম্পর্কে বলেনতিনি ছিলেন একজন মহান বিবেকবান , তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সে অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা ,মানুষ করতেন।তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটান এবং তার সময় রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন আলেমগন। তিনি রমজান মাসে হজ্জে যান এবং তিনি দুনিয়াতেও ফেরেশতাদের মোত জীবন যাপন করেছেন আখিরাতেও তিনি ফেরশতা।

সেলজুক রাষ্ট্রের পতন

সুলতান মালিকশাহ যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তার চার ছেলে জীবিত ছিল। তারা হলেনবারকইয়ারু ,কসানজার এবং মুহাম্মাদ। মাহমুদ ,মাহমুদ , পরবর্তীতে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নামে পরিচিতি লাভ করেন।তার অপর ,সন্তানগন তাকে সুলতান হিসাবে নির্বাচন করেন এবং তার হাতে বায়াত করেন

কেননা তার মাতা ছিলেন তুরকান খাতুন। মালিকশাহের জীবদ্দশায় তার প্রভাব ছিল অনেক বেশী। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনকাল ১০৯২ সাল হিজরি) ৪৮৫) থেকে ১০৯৪ সাল ১০৯৪ হিজরি))পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর স্থায়ী হয়।সেই বছর সে এবং তার মাতা উভয়েই মৃত্যুবরণ করেন।

এর পর মসনদে আসীন হন মালিকশাহের অপর সন্তান সুলতান বারকইয়ারুক। তার শাসনকাল ১১০৫ সাল ৪৯৮ হিজরি)) পর্যন্ত স্থায়ী হয়।এর পর মসনদে আসীন হন রুকনুদ্দীন মালিকশাহ। সেই একই বছর সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহন করেন গিয়াসউদ্দিন আবু শুজা মুহাম্মাদ। হিজরি ৫১১ পর্যন্ত খ্রিস্টাব্দ ১১২৮)) পর্যন্ত তার শাসনকাল স্থায়ী হয়। বিশাল সেলজুক রাষ্ট্রের সর্বশেষ শাসক তিনিই ছিলেন। তার প্রভাবাধীনে ছিল ইরাকইরান এবং খোরাসানের বিশাল এলাকা। , হিজরিতে ৫২২) সালে ১১২৮ এবং) খাওয়ারিজম শাহদের হাতে এই রাষ্ট্রের পতন হয়। ফলশ্রুতিতে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের শক্তি সামর্থ্য চরমভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। এর ফলে তারা বিভিন্ন গ্রুপ এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতীতে তাদের মধ্যে যে একটি সংগ্রামী চেতনা ছিল সেটা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে এই বিশাল সেলজুক রাষ্ট্র ছোট ছোট রাষ্ট্রে রুপ লাভ করে এবং প্রধান হন বিভিন্ন গোত্র পতি গন। এই ছোট রাষ্ট্র সমুহ এবং গোত্রীয় সমাজ সমুহ কোন একজন আমীরের নেতৃত্ব গ্রহন করতে ব্যর্থ হন।

ফলে সেলজুক রাষ্ট্র আর তার অতীতের শক্তি সামর্থ্য ফিরে পায়নিযেমনটি , সুলতান আল পারসলান এবং মালিকশাহের ,পেয়েছিল তুউরুল বেয় এর সময় সময়ে। কিন্তু তারা বিভিন্ন নেতৃত্বের অধীনে সেলজুক রাষ্ট্রেরই অংশবিশেষ ছিল। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কোন সাহায্য সহযোগিতাছিল না।

পরবর্তীতে খাওয়ারিজম রাষ্ট্র মাওয়ারাউননেহির অঞ্চলে মোগলদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যার ফলে উত্তর ইরাক এবং শামে আতাবেইলিক নামক সেলজুকীয় আমীরগণ তাদের রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন।

এই সময়ে আনাতলিয়াতে সেলজুকীয়গণ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং তারা ক্রুসাদারদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং তারা এশিয়া মাইনরের

উত্তর পূর্ব অংশকে ক্রুসেদারদের কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে তারা মোগলদের ধংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি।

সেলজুক সালতানাতের পতনের পেছনে অনেক কারণ নিহিত ছিল। তাদের মধ্যে কিছু হল ;

১চাচাদের মধ্যে এবং নাতনীদের মধ্যে ক্ষমতার দন্দ চরম ,ভাইদের মধ্যে / আকার ধারন করে।

২ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহন। /

৩উজির ,কিছু কিছু আমীর উমরাহ / কর্তৃক সুলজুকীয় সুলতান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৪সেলজুকীয়দের সমরশক্তি আব্বাসী খিলাফাতের তুলনায় ছিল অনেক / শক্তিশালী। ফলে যারাই সেলজুক রাষ্ট্রের সুলতান হিসাবে যেই অধিস্থিত হত তাকে নিয়েই সেনাবাহিনীর মধ্যে সমালোচনা হত।

৫ ,সেলজুক রাষ্ট্র শাম /মিশর এবং ইরাকের বিভিন্ন শহরকে আব্বাসী খিলাফাতের পতাকা তলে একত্র করতে ব্যর্থ হয়।

৬সেলজুকীয়দের মধ্যে আন্তঃকলহ এবং বিভাজন। যেটা মুলত / সেলজুকীয়দের পতনের মুল কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। অবশেষে ইরাক তাদের হাত ছাড়া হয়ে পড়ে।

৭সেলজুক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাতিনীদের অ /ব্যাহত ষড়যন্ত্র । তারা সেলজুক রাষ্ট্রের আমীরসুলতান এবং সেনাপতিদেরকে হত্যা করার জন্য একের পর , এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।

৮সাগরের অপর পাশ থেকে আগত ক্রুসেদারদের অব্যাহত আক্রমন এবং / ইউরোপ থেকে আগত বহিঃশত্রুর সাথে দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।

তবে সেলজুকীয়দের সফলতাও কম ছিল না। তারা অনেক খেত্রে সফলতার উচ্চশিখরে উন্নিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হল;

ক। আব্বাসী খিলাফতকে টিকিয়ে রাখার পেছনে তাদের অনেক বড় ভুমিকা ছিল। তারা পতনোম্মূখ আব্বাসী খিলাফাতকে দীর্ঘ ২ শত বছর টিকিয়ে রাখতে

সক্ষম হন। রাফেজি শিয়াদেরকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে আনা এবং তাদের রাষ্ট্রের পতন ঘটানোর খেত্রে সেলজুকীদের ভুমিকা অনস্বীকার্য।

খ। মিশরের উবেয়দী রাষ্ট্র মুসলিম আরবকে বাতিনী এবং রাফেজীদের পতাকাতলে সমবেত করার প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে বাধ সাধেন সেলজুকীয়গণ তারা এই সকল ভুমিকে এবং মুসলমানদেরকে তাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

গ। সেলজুকী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মুসলমানদেরকে আব্বাসী খিলাফাতের পতাকাতলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করা।

ঘ। সেলজুকীগন তাদের অধ্যুষিত এলাকায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং সে সকল অঞ্চলে নিরাপত্ত্বা ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন।

ঙ। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যর আক্রমণকে শক্তভাবে মোকাবেলা করে তাদের প্রেরিতে ক্রুসেদারদেরকে পরাজিত করেন এবং মোগলরা যেভাবে খিপ্রতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল সেটাকে তারা ধীর গতিতে নামিয়ে আনেন।

চ। তাদের অধ্যুষিত এলাকায় সুন্নি আলেমদের এবং মাযহাব সমুহের প্রভাব বৃদ্ধি করেন এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।
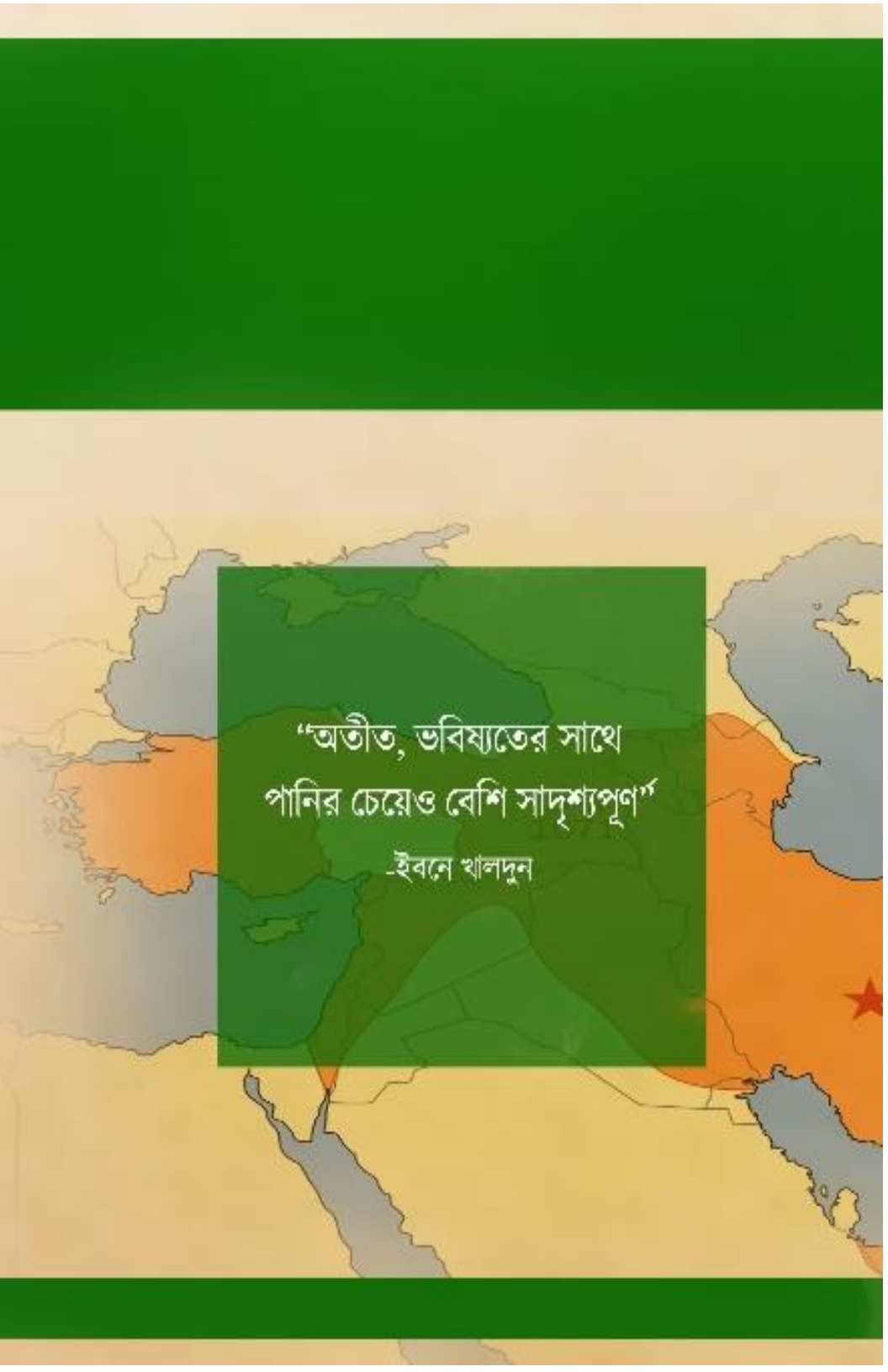
এইগুলী হল সেলজুকীদের অবদানের মধ্যে কিছু অবদান। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা এবং মিথ্যা প্রচারণা চালানো জুলুম এবং অন্যায়।

সেলজুক আমলে প্রতিষ্ঠিত ইস্ফাহান মাদ্রাসা
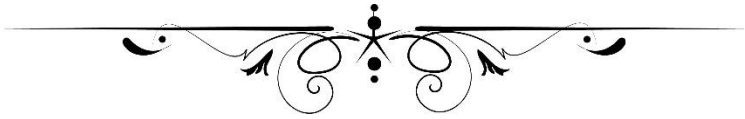
“অতীত, ভবিষ্যতের সাথে
পানির চেয়েও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ”
-ইবনে খালদুন